বঙ্গবন্ধুর জাতীয় ঐক্যের দর্শন

পাশা মোস্তফা কামাল

একটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য ভৌগলিক ও ভাষাগত ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 'জাতীয়তা'। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর এক নদী রক্ত পেরিয়ে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন দেশ ও পতাকা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে সারাটি জীবন উৎসর্গ করে অবশেষে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অপার ভালোবাসার জোরে ছিনিয়ে এনেছিলেন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড যার নাম বাংলাদেশ। দীর্ঘ তেইশ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ভিত্তিই ছিল বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয়। পাকিস্তানীদের মতো গোঁয়ার ও বর্বর ঔপনিবেশিক শক্তির বুক চিরে কোনো কাল্পনিক যাদুমন্ত্রবলে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়নি। প্রেক্ষাপট, কার্যকারণ বহু ছিল। কিন্তু একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবে পৃথিবীর অনেক জাতিকে যেমন যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে বাঙালির তেমনটি হয়নি। কারণ বাঙালি পেয়েছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা সম্মোহনী শক্তির অধিকারী একজন সত্যিকারের জননেতা যাঁর সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক চিন্তাশীল নেতৃত্বে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হতে পেরেছিল।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলছেন, 'জাতি' হচ্ছে সেই সকল মানুষের সমষ্টি যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে, একই রকম সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পালন করে, আকার আকৃতির দিক থেকেও তারা মোটামুটি একই রকম, একই ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং ওই ভূখণ্ডের স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়ে একাত্মতা পোষণ করে। মূলত এই ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭১ সালে বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজেদের একটি স্বাধীন ভূমি প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাধীনতার পর তিন বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। মাত্র তিন বছরের শাসনে তিনি একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে যে মাত্রায় অগ্রগতি সাধন করেছিলেন তা ইতিহাসে বিরল। তরুণ শেখ মুজিব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা, নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতাদের ভাবধারায়। তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে ছিল বাঙালি জাতির জন্য একটি উন্নত ও ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের স্বপ্ন। তিন বছরের উন্নয়নে যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত হলেও বঙ্গবন্ধু সেই গতিকে আরো গতিময় করে তোলার জন্য এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে সকল স্তরের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাকশাল।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আমদের তখন ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল খুব জরুরি। শোষণহীন ও উন্নত আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে, বঙ্গবন্ধু সাংবিধানিক ধারার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এবং জীবনবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের একটি পদ্ধতিগত কাঠামো নিহিত ছিল বাকশাল ব্যবস্থায়।

তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের ফলাফল হিসেবে নাজিল হওয়া চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করে। আমাদের সেকেলে কৃষি ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিলতার কারণে খাদ্য সংকটে পড়তে হচ্ছে। খাদ্য এবং কৃষিতে বিদেশের উপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সংকট দিনদিন বেড়ে চলেছে। কৃষি খাতকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানো গেলে আমাদের খাদ্য সংকট দূর হওয়ার

পাশাপাশি শিল্পখাতকেও উন্নত করা সম্ভব। বাংলাদেশকে তখন প্রতি বছর ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। তাই অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংকট মোকাবেলায় আমাদের কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছিল।

সেটি বাস্তবায়ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুষ-দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের মনোজাগতিক-প্রশাসনিক সমস্যা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ৩ বছর তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করিয়েও সামগ্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করলেন। তাই তিনি রাজনৈতিক দল, অরাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত যেকোনো নাগরিক, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখার সুযোগ সম্বলিত একটি জাতীয় দলীয় ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বাকশালে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলে এক টেবিলে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ছিল। সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকার ফলে দেশে একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীতাও রহিত হয়েছিল। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী ও স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুপরবর্তীকালে এটাকে একদলীয় ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বলে অপপ্রচার চালায়। বর্তমানেও তাদের এ অপপ্রচার অব্যাহত আছে বলে বঙ্গবন্ধুর এই রাজনৈতিক দর্শন এখনো প্রায় চাপা পড়ে আছে বা এদিকে সকলের মনযোগের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলেই মনে হয়।

বাকশাল ব্যবস্থার প্রথম ইতিবাচক দিক হচ্ছে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ১৯৭৫ সালের ২২ জুন তারিখে এক ঘোষণার মাধ্যমে দেশের ৬১টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৬ জুলাই তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়। এতে সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ আমলাসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল কথাই ছিল দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী নয়, তাঁর কাছে মূখ্য ছিল মানুষ। আর একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর দর্শন।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও গবেষক ড. নূহ-উল-আলম লেনিন বলেন, "মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট আদর্শের সমাজতন্ত্রী না হলেও বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব বীক্ষায় একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি যে 'সমাজতন্ত্র' তা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না। বঙ্গবন্ধু মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজ এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকেই সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন।"[১] ড. লেনিন বাকশাল ব্যবস্থায় তারই প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন যার সাথে অনেক গবেষকই একমত পোষণ করেছেন।

"বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থায় দেশকে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো দুরূহ। সাবোটাজ, ধ্বংস, ষড়যন্ত্র, দুর্নীতির মূলোৎপাটন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সর্বোপরি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হলে গোটা ব্যবস্থারই পরিবর্তন দরকার। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। সমাজের কল্যাণকামী, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় পুনর্গঠনের মহাকর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। অনেকেই বিষয়টিকে আক্ষরিক অর্থে 'একদলীয় শাসন' হিসেবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু 'বাকশাল' নামে যে জাতীয় ঐক্যের প্লাটফরম করেন, সেখানে সর্বস্তরের জনসাধারণ, বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও রাজনৈতিক

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, অতীতের ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক নিয়ম-রীতি ভেঙে দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর সদস্য, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, শ্রমিক, কৃষক, নারী-পুরুষ– সবাই যেন জাতি গঠনের কাজে অভিন্ন রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং সকলের মেধা-শ্রম যেন জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগে, সে জন্যই এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সিভিল প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সচিবগণ এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ ও উপ-প্রধান জেনারেল জিয়াসহ অনেকেই জাতীয় দল বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সমগ্র দেশে একটা অভিনব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।"[২]

এই যে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে একটি প্লাটফরমে নিয়ে এসে একটি সমন্বিত উন্নয়ন তত্ত্ব- এই বিষয়টিকে সোভিয়েত বিপ্লবের নেতা মহামতি লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাথেই তুলনা করা চলে। গবেষক ও রাজনীতিবিদ ড. নূহ-উল-আলম লেনিনের ভাষায় বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব বীক্ষায় একটি শোষণহীন ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা জাতিরাষ্ট্র গঠনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বা প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতি কার্যকর হলে দেশে রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসা তৈরি না হয়ে রাজনীতিবিদদের সকল প্রজ্ঞা ও মেধা দেশ গঠনের কাজে লাগতো। একই প্লাটফরমে আলোচনা এবং সমালোচনার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গহণ করা হলে যে কোনো সিদ্ধান্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তযুক্ত হতো। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে যথাযথ ফোরামে সমস্যার সমাধান হতো। পার্লামেন্টে সকল পেশার প্রতিনিধি থাকার কারণে সেখানেই ডিবেটের মাধ্যমে সমস্যাগুলো সমাধান করা যেত।

তবে সবকিছুর জন্য যেটা প্রয়োজন হতো তা হলো প্রত্যেকের উদার মানসিকতা। একটি শিক্ষিত যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা এই কাঠামোর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারতো। এখানে একটি কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথমত একটি সুদক্ষ নেতৃত্ব ও একটি চমৎকার রাষ্ট্রকাঠমো। বঙ্গবন্ধু সেই কাঠামোটাই তৈরি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন কেন এই পরিবর্তন। তাঁর ভাষায়, "কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। আমি কেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছি? এই ঘুণে ধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানী আমলের যে শাসনব্যবস্থা, তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সেজে গড়তে হবে। তা হলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বছর দেখেছি। দেখেশুনে আমি স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি এবং তাই জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা।"

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঘাতকরা হত্যা করেছে একটি উদারনৈতিক রাজনৈতিক আদর্শের, যা ছিল এই দেশের মাটি ও মানুষের উপযোগী এক সুসংগঠিত ও সর্বজনীন উন্নয়ন দর্শন।

#

পিআইডি ফিচার